ড. এ. কে. এনামুল হক

দেশের উন্নয়নে শিক্ষার জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

কভিডের আক্রমণে ঘরে বসে আছি। ডাক্তারের পথ্য খুবই সামান্য, কিন্তু পারিবারিক চাপ অনেক বেশি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় গরম পানি পান করতে হবে, গরম পানির গড়গড়া করতে হবে। লেবুর শরবত, স্যুপ খেতে হবে। চাপ মনে হলেও বুঝতে বাকি নেই যে এতসব পথ্যের পেছনে রয়েছে ভালোবাসা। কিন্তু ডাক্তারের কথামতো বসে রয়েছি এক কক্ষে। আগেও বলেছি, আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ইচ্ছে করলেই একটি রুমে একাকী থাকা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশের কোটি মানুষের সে ভাগ্য নেই। তাদের ক্ষমতা নেই একটি পৃথক কক্ষ বের করা। ঘরে তো রয়েছে একটিই কক্ষ। কোথায় তারা পৃথক থাকবে?

ঘরে বসে সময় কাটানোর উপায় হচ্ছে বই পড়া কিংবা সিনেমা দেখা। আধুনিক জীবনে কিছুটা সুবিধা আছে। ইউটিউবে ইচ্ছামতো মুভি দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, আজকাল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ইউটিউব কেমন করে যেন মনের কথা জানতে পারে। আমাকে একটি মুভি দেখতে বলল। সারভাইভিং উইথ দ্য উলফ। ২০০৭ সালের ছবি। মূল গল্পটি সত্যিকারের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত বলে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মিশা নামের একটি উপন্যাসে। আট-নয় বছরের একটি মেয়ের জার্মান নাৎসির অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকার কাহিনী। মেয়েটি বেলজিয়ামের ফরাসি ভাষার একটি মেয়ে। কাহিনী সত্য বলে প্রচারিত হলেও অনেকের মনেই সন্দেহ জাগে। অবশ্য লেখিকা অবশেষে স্বীকার করেছেন, কাহিনীটি কাল্পনিক।

গল্পের শুরু ১৯৪২ সাল। একটি দৃশ্যে দেখা গেল, স্কুলের ছাত্ররা ক্লাসে ৭-এর নামতা মুখস্থ করছে। সাতে একে সাত, সাত দুগুণে চৌদ্দ ইত্যাদি। সেই ১৯৪২ সালের পড়াশোনা, যার লেশমাত্র নেই এখন সেখানকার স্কুলে। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে তারা পরিবর্তন করেছে এ মুখস্থ প্রথার। দরকার নেই। নামতা মুখস্থ করার মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই। ওটা ক্যালকুলেটরে করা যায়। মোবাইলেও করা যায়। তবে জানতে হবে গুণ কেন করতে হয় কিংবা যোগ ও গুণের মধ্যে পার্থক্য কী? আমার চোখটা সেই নামতা শেখার ক্লাসেই আটকে গেল। মনে হলো আমার ছেলেবেলার কথা। নামতা মুখস্থ করতে কত গালমন্দ খেতে হয়েছে। অথচ সেদিন দেখলাম এক চাইনিজ ও এক ভারতীয় ছাত্রী বিশাল এক গুণন চোখের পলকে করে ফেলল। শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডে লিখলেন ৯৭কে ৯৫ দিয়ে গুণ করলে কত হবে? একজন আমাদের মতো গুণ করতে লাগল, অন্যজন ৬ সেকেন্ডের মধ্যে লিখে দিল ৯,২১৫। অবাক কাণ্ড এতগুলো নামতা মুখস্থ করা ছাড়াই সে তা করে ফেলল! বুঝতে পারলাম, শেখার নিয়মও পাল্টাচ্ছে।

পড়ছিলাম সরকার ঘোষিত বাংলাদেশের শিক্ষার জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো নামে প্রকাশিত সরকারি দলিলটি। দেশকে আগামী শতকের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার সম্প্রতি এ কাঠামো ঘোষণা করেছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। শতাব্দীর পুরনো শিক্ষা, যার সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশদের দোসর শাসক তৈরি করার জন্য। তাদের উদ্দেশ্য এতটাই সার্থক যে আজ পর্যন্ত শিক্ষিত যুবকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য সরকারি চাকরি। কদিন আগেই পড়লাম, কোনো এক বিসিএস পরীক্ষায় বুয়েটের ৮২ জন, কুয়েটের ৬৪, রুয়েটের ৫৯ ও চুয়েটের ৫৫ জন বিসিএস সাধারণ ক্যাডারে চাকরি নিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, তারা কেউই ইঞ্জিনিয়ার হতে চান না। শুধু তা-ই নয়, আমাদের চোখে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই ভালো, যেখানে ছাত্র ভর্তির প্রতিযোগিতা অধিক। আবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতে, সেই বিশ্ববিদ্যালয় ভালো, যে কিনা ডলার খরচ করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের তালিকায় নাম লেখাতে পারবে। অনেক বছর এসব তালিকা দেখে মনে হয়েছে, রাশিয়ায় কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে? কারণ তাদের কোনো নাম নেই। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের পারদর্শিতা অবাক করার মতো। এখনো যখন কম্পিউটার বিজ্ঞানকে তুলনা করবেন দেখবেন রাশিয়া, চীন, ইরানের পর ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের স্থান। তাহলে সেরা বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় রাশিয়া নেই কেন? উত্তর পাবেন না। কারণ বাজার অর্থনীতিতে নিজেদের বাজার তৈরি যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে শিকারি মনোভাবের প্রভাবে প্রতিযোগীকে মেরে ফেলতে পারলেই বাজার থাকে নিজের দখলে। তাই দেখবেন, এসব তালিকায় রাশিয়া নেই।

এতসবের মধ্যে দেশের উচ্চশিক্ষায় একটি যোগ্যতা কাঠামো তৈরির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তৈরি করা এক কথা আর বাস্তবায়ন করা ভিন্ন। আমাদের মনের ভূত অনেক বড়। তার প্রভাব বেশি। তবে তার আগে আসুন, দেখি কী আছে এ দলিলে?

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম তৈরিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলেই তৈরি করা হয়েছে এ দলিলে। এখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকরি লাভ নয়; বরং বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে কর্ম সৃষ্টি করা। অর্থাৎ শিক্ষিত যুবক তার জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করবে নতুন দিগন্ত। তৈরি করবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। উচ্চশিক্ষাকে উপনিবেশমুক্ত করার লক্ষ্যে এখানে বেশকিছু প্রস্তাব আছে, যার কয়েকটি প্রশংসাযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে, কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয়, জীবনশিক্ষাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে আনা যাবে। জীবনশিক্ষাকেও পুঁথিগত শিক্ষায় রূপান্তর করার জন্য ঘণ্টা গণনার সূত্রও এখানে দেয়া আছে। ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সময় যে কথা বলা হয়েছিল, সে কথাটিকে আমরা ২০২১ সালে স্বীকৃতি দিয়েছি। বলা হয়েছে, ঘরে পড়া শিক্ষার্থী তার কর্মদক্ষতাকে জ্ঞানে রূপায়ণ করে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে।

প্রায় ১২ বছর আগে একুশ শতকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে দুবাইয়ে এ সম্মেলনে উপমহাদেশের অনেক আচার্য, উপাচার্যর সামনে আমি এক বক্তব্যে বলেছিলাম, এক জীবনেই আমরা আমাদের সব আশা পূর্ণ করতে চাই। শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় সে সুযোগ থাকা উচিত। পৃথিবীতে কেবল আমাদের উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষা চালু থাকার কারণে আমাদের এক জীবনের আশা পূরণ করতে কয়েকবার জন্ম নিতে হবে। এটাই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আমি ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার এক জনমে হতে পারি না। কিন্তু কেন না? এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আমার এক আত্মীয় লন্ডনে ইসলামী পড়াশোনা শেষ করে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল। তার পড়াশোনার খরচ বাবা জুগিয়েছেন। সে মা-বাবার ইচ্ছা পূরণ করেছিল। কিন্তু তার আশা তখনো পূর্ণ হয়নি। ফিরে এসে সে বলল, আমার ইচ্ছা আমি ডাক্তার হব। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় তা সম্ভব। সে ও লেভেল ও এ লেভেলের কেবল বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারি পড়ে আজ ডাক্তার। দুটো ইচ্ছা সে পূরণ করেছে। আমাদের দেশে কি সম্ভব? আমার একটি জীবনে কেন আমি পারব না? একবার ভেবে বলুন। আমার ৩০ মিনিট বক্তৃতার পর অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এ উপমহাদেশে শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা উচিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ দলিল এতটুকু যায়নি, তবে বলেছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে ভর্তি যোগ্যতায় জীবন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি থাকবে। অর্থাৎ কেবল পুঁথিগত বিদ্যাকে একমাত্র ভর্তি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে না। আমার কাছে এ স্বীকৃতি একটি বড় পাওয়া। বহুদিন আগে এক নারীর কথা মনে পড়ে। তিনি স্নাতক পড়তে পড়তে বিয়ে করে সংসারী হয়ে গিয়েছিলেন। আর পড়া হয়নি। ২০ বছর পর তার মনে হয়েছে, তার স্নাতক পড়াটা শেষ করা দরকার। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে

> শিক্ষাক্রমকে কেবল নিয়মনীতিতে বন্দি করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষার কারিগর শিক্ষক। শিক্ষকের স্বাধীনতা দিয়েই তার উন্নয়ন করা সম্ভব। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এক হলেই কিংবা সব পরীক্ষা এক হলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না। প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্বাধীনতা সৃষ্টি করা (অবশ্যই নিয়মের মধ্যে)। ওই যে বলেছিলাম নামতা মুখস্থ করার মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই, যতটুকু রয়েছে নামতা ব্যবহারের মধ্যে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ তখনই তবে যখন শিক্ষক তা সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবেন

আগের ক্রেডিট ঘণ্টাকে রূপান্তর করে অতিরিক্ত কিছু কোর্স করে স্নাতক শেষ করেছেন। পরবর্তী সময়ে পিএইচডিও করেছিলেন। এই প্রথম, তাই আমাদের দেশের এ দলিলে বলা হয়েছে, শিক্ষার ধাপগুলো ক্রেডিট ঘণ্টা দ্বারা সাজাতে হবে। ক্লাসরুমের ১ ঘণ্টা হবে মাঠের ২ ঘণ্টার সমান এবং মাঠের অভিজ্ঞতার ২ ঘণ্টাকে তাই ক্রেডিট ঘণ্টায় রূপান্তর করে শিক্ষা ব্যবস্থায় ঝরে পড়া মানুষের সাধ পূরণ করা সম্ভব। আমার বাবার কথা মনে পড়ে। তিনি ম্যাট্রিক পাস করে চাকরিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি শেষে স্নাতকতুল্য ডিগ্রি করেছেন। দিন শেষে আমরা যখন বড় হয়েছি, তিনি তখন ভাবলেন, তার অভিজ্ঞতাকে কি তিনি সাধারণ শিক্ষায় রূপান্তর করতে পারবেন? পারেননি। তবে সে সময় একটি সুযোগ ছিল। প্রাইভেট পরীক্ষা। তিনি ক্রমে ঘরে বসে, চাকরি করে এইচএসসি ও স্নাতক পাস করেছিলেন। এখন তো দেশে প্রাইভেট পরীক্ষাও বন্ধ। কারণ? তাতে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র থাকে না। একজন ছাত্রের জীবন বড়, নাকি শিক্ষকের চাকরি বড়। কোনটির প্রাধান্য বেশি হওয়া উচিত? আমি যদি পরীক্ষা দিয়ে পাস করি, তবে কেন ক্লাসে সময় নষ্ট করব? তাই তো আমার প্রথম জীবনে আমি যখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করি, তখন গর্বিত ছিলাম। বহু মানুষের মনে সুপ্ত আশা পূরণের একটি বৃক্ষ স্থাপিত হলো। সরকারি এ দলিলে ক্রেডিট ঘণ্টার মাধ্যমে শিক্ষার যে কাঠামো এখন স্বীকৃতি পেল, তাতে শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। একই ব্যবস্থা আমাদের বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বহুদিন ধরে চালু করেছি। যেমন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি ইচ্ছে করলে আপনার ইচ্ছামতো অন্য কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে পড়তে পারবেন। তবে প্রয়োজনীয় প্রাক-কোর্স করে নিতে হবে। এবার তা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হলো।

দলিলটির আরো একটি বিষয়ে নতুনত্ব রয়েছে। একটি নিয়মে বলা হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হলে পরিবর্তন করতে হবে পাঠদান পদ্ধতিতে, পাঠক্রমে ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে। প্রচলিত নামতা শেখানোর পরিবর্তে এখানে শিক্ষাকে চারটি মৌলিক দক্ষতায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, কেবল জ্ঞানার্জন নয়, শিক্ষার্থীর থাকবে জ্ঞান প্রদর্শনের দক্ষতা, জ্ঞান ব্যবহারের দক্ষতা, জ্ঞান প্রয়োগের দক্ষতা, জ্ঞান যাচাইয়ের দক্ষতা এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির দক্ষতা। কেবল সাক্ষরতা নয়, থাকবে আধুনিক ডিজিটাল সাক্ষরতা। দ্বিতীয়ত, তাদের থাকতে হবে সামাজিক দক্ষতা, যার মাধ্যমে তারা সমাজে সবার সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সাবলীলভাবে যোগাযোগ করতে পারে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারে, কর্মক্ষেত্রে মর্যাদার সঙ্গে চলতে পারে এবং হবে সুনাগরিক। থাকবে সমাজ চেতনা। তৃতীয়ত, তারা হবে চিন্তা বা ধারণায় দক্ষ, যেন লব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে দক্ষতার সঙ্গে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং চতুর্থত, তাদের থাকবে কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলি, যার মাধ্যমে তারা দেশে কর্মসংস্থান তৈরি করবে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ ও ন্যায়নীতির মূল্যবোধ নিজে সমুন্নত রাখবে এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে। বিশদ লিখলাম, কারণ আমার ধারণা, আমাদের দেশে শিক্ষার এমন বৈপ্লবিক দিকনির্দেশনা এই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পাঠ্যক্রম যেন সৃষ্টি করে একজন দক্ষ যুবক, যে সমাজকে দিতে আগ্রহী হবে।

শিক্ষাক্রমকে কেবল নিয়মনীতিতে বন্দি করে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষার কারিগর শিক্ষক। শিক্ষকের স্বাধীনতা দিয়েই তার উন্নয়ন করা সম্ভব। শুনেছিলাম, প্রয়াত অধ্যাপক আহমেদ শরীফের ক্লাসে একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা বিভাগের এক ছাত্রী বসতে চাইল। কী কারণ? ছাত্রী বলল, স্যার, আমরা ভালো শিক্ষক নির্ণয় পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছি। আপনি তো একজন সফল শিক্ষক, তাই দেখতে চাইছি ভালো শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি কি আপনি অনুসরণ করছেন? অধ্যাপক শরীফ রেগে আগুন। আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে! ছাত্রী নাছোড়বান্দা। তার গবেষণা আকাশে উঠবে! শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে বললেন, ওই কোনায় বসে নীরবে পর্যবেক্ষণ করো। টুঁ শব্দটি করবে না। ছাত্রী তা-ই করল। কিছুদিন পর সে জানাল, স্যার আমরা গবেষণায় যা পেয়েছিলাম, আপনি তার প্রতিটি উপাদান দিয়ে আপনার ক্লাস পরিচালনা করেন। অধ্যাপক শরীফ কিছু না জেনেই ভালো শিক্ষকের সব গুণাবলি আয়ত্ত করেছিলেন। আমাদের সব শিক্ষক তা হয়তো পারবেন না। লাগবে প্রশিক্ষণ।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এক হলেই কিংবা সব পরীক্ষার প্রশ্ন এক হলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না। প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্বাধীনতা সৃষ্টি করা (অবশ্যই নিয়মের মধ্যে)। ওই যে বলেছিলাম, নামতা মুখস্থ করার মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই, যতটুকু রয়েছে নামতা ব্যবহারের মধ্যে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ তখনই তবে, যখন শিক্ষক তা সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবেন। আবার সব শিক্ষার্থী এক নয়। বিধাতার এ সৃষ্টিতে আপনার সব পুত্র-কন্যা যেমন একই মেধাসম্পন্ন নয়, তেমনি শিক্ষা কার্যক্রম যাচাইয়ের জন্য একই পদ্ধতি ব্যবহার আধুনিক যুগে অচল। একই পাঠদান পদ্ধতিও সমানভাবে অচল। কেউ পড়ে শেখে, কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে, কেউ দলে মিশে শেখে, এমন অনেক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা শিক্ষকেরা তা যাচাই করি। অথচ আমাদের দুর্ভাগা দেশে আমরা এতদিন একটি পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত ছিলাম। তা হলো পরীক্ষা। সরকারের এ দলিলে প্রথমবারের মতো বহুমুখী মূল্যায়ন ব্যবস্থা স্বীকৃতিও রয়েছে।

সব পড়ে আমি নিজে যেমন অবাক হয়েছি, তেমনি প্রশংসা করেছি প্রণেতাদের। তাদের মাধ্যমেই হয়তোবা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। তবে হোঁচট খেয়েছি ১৫তম পৃষ্ঠায়। দেখলাম, বলা হয়েছে, এক ক্রেডিট হবে ৪০ ঘণ্টা পাঠদানে (!) আবার নবম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, এক ক্রেডিট ঘণ্টা পরিমাপ করা হবে প্রতি সপ্তাহে ১ ঘণ্টা হিসেবে ১৪ সপ্তাহের পাঠদানের মাধ্যমে। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। এতদিনে ১৪-এর নামতা তো ভুলেই গিয়েছি। মনে হতে পারে, লেখার ভুল, কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছে না, ১৪কে কোনো কিছু দিয়ে গুণ করে ৪০ বানানো যাচ্ছে না। বুঝতে পারলাম, দুটো সূত্র দুই জায়গা থেকে তুলে আনা হয়েছে। সমস্যার শেষ এখানেই নয়। উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এখন বছরকে দুটো ভাগে ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। ৫২ সপ্তাহের বছর দুই ভাগ করলে সরকারি ও অন্যান্য ছুটি বাদ দিলে বছরে ৪২-৪৪ সপ্তাহের বেশি সময় পাওয়া যায় না। তাই এখানে ১৪ সপ্তাহের হিসাবটিই অবান্তর। ১৪ সপ্তাহ হিসাবটা কেবল ট্রাইমিস্টার বা চতুর্মাসিক পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য। তাহলে গোঁজামিল হলো কেন? দলিলে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষায় ক্রেডিট ঘণ্টা হবে একটি মুদ্রার মতো। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠক্রমের বিভিন্ন ধাপের মান-বিনিময় নির্ভর করবে। তাই এ মুদ্রার নিজের মূল্যটি সঠিক হওয়া দরকার। পাঠ্যক্রম চলবে চতুর্মাসিক হিসাবে আর মূল্যায়ন হবে ষাণ্মাসিক হিসেবে? কীভাবে সম্ভব? তবে কি সরকারেরই উচ্চশিক্ষার দুটি প্রতিষ্ঠান দুটি পৃথক মুদ্রা নিয়ে খেলছে?

বিষয়টির সুরাহা হয়তোবা সহজেই হবে। তবে আমার আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমরা কি পরিবর্তন অনুধাবন করে পরিবর্তন আনছি, নাকি পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন করছি? দলিলটিতে পরীক্ষার বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিকে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দলিলপ্রণেতাদের কাছে জাতি কৃতজ্ঞ। আমরা ঔপনিবেশিক মানসিকতামুক্ত হয়েছি। এর উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট। বিশ্লেষণও পরিষ্কার। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সবাই কি তা অনুধাবন করেছেন? যদি তা না হয়, তাহলে কালক্রমে যে লাউ সেই কদুই হবে। দলিল দলিলই থাকবে। বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তা হবে 'সৃজনশীল মুখস্থ' ব্যবস্থার মতো কিছু একটা। আমার ভয় সেখানে। আশা করি, উচ্চশিক্ষায় জড়িতরা ভাববেন।

ড. এ. কে. এনামুল হক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ, ঢাকা